একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Two men in existential crisis: Debesh Roy's Bagharu and Buddhadev Guha's Thutha Baiga

অস্তিত্বের সংকটে দুই পুরুষ: দেবেশ রায়ের বাঘারু ও বুদ্ধদেব গুহর ঠুঠাবাইগা

Name of the Author: **Pinki Roy**

Affiliation: **Assistant Teacher, Kashimnagar High school (Higher Secondary), Murshidabad, West Bengal, India**

Abstract: Both Debesh Roy and Buddhadeb Guha were two prominent fiction writers of the second half of the 20th century. Both of them have contributed literary works of different flavors to Bengali literature. Two important characters created by these two writers are Bagharu and Thutha Baiga. Bagharu from Debesh Roy's novel '*Tista parer Brityanta'* and Thutha Baiga from Buddhadev Guha's novel '*Madhukori'*. These two characters are not exactly alike. The backgrounds of the two novels are different. Naturally, their habitats are also different.But when you observe or feel their physical warmth, temperament, and above all, their position in the novel, the names of one person and the other naturally emerge.The existential crisis of both Bagharu and Thutha is observed in the novel. However, Thatha Baiga is aware of his roots. We see him restless in search of roots. But Bagharu is not very aware of his roots. He can only be seen drifting with the flow of time, environment, and circumstances.

Keywords: Jungle, Adibasi, Rajbangshi, Teesta River, The Roots, Hunting.

অস্তিত্বের সংকটে দুই পুরুষ: দেবেশ রায়ের বাঘারু ও বুদ্ধদেব গুহর ঠুঠা বাইগা

পিংকী রায়

দেবেশ রায় ও বুদ্ধদেব গুহ দুজনেই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দুই বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যে তাঁরা দুজনেই ভিন্ন স্বাদের সাহিত্যসম্ভার উপহার দিয়েছেন। একজন তৎকালীন সময়, সমাজ এবং সেই প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মানুষের অন্বেষণ চালিয়েছেন। অন্যদিকে বুদ্ধদেব গুহ কৈশোর থেকে নানা জঙ্গলে ভ্রমণ করেছেন। জঙ্গলের আদপ-কায়দা, বন্যপ্রাণী, বন-সংলগ্ন মানুষ ও তাঁদের সংস্কার খুব কাছ থেকে দেখে যে-বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই দুই সাহিত্যিকের সৃষ্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল বাঘারু ও ঠুঠা বাইগা। দেবেশ রায়ের ‘ *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’* উপন্যাসের বাঘারু এবং বুদ্ধদেব গুহর ‘ *মাধুকরী’* উপন্যাসের ঠুঠা বাইগা। এই দুটি চরিত্র একেবারেই হুবহু একরকম নয়। দুটি উপন্যাসের পটভূমি ভিন্ন। স্বভাবতই তাদের বিচরণস্থলও ভিন্ন। কিন্তু তাদের দৈহিক গড়ন, স্বভাব, আচরণ এবং সর্বোপরি উপন্যাসে তাদের অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ করলে বা অনুভব করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই একজনের পাশে আর একজনের নাম বা চিত্র ফুটে ওঠে। বাঘারু ও ঠুঠা বাইগা দুজনেরই অস্তিত্বের সংকট উপন্যাসে লক্ষ করা গেছে। তবে ঠুঠা বাইগা নিজের শিকড় সম্পর্কে সচেতন। তাকে আমরা শিকড়ের সন্ধানে অস্থির হতে দেখি। কিন্তু বাঘারু নিজের শিকড় সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। তাকে সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির স্রোতে শুধুভেসে যেতে দেখি।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসটির আদিপর্ব ও বনপর্ব ১৯৮০ ও ১৯৮১-র ‘শারদীয় বারোমাস’ পত্রিকায়, চরপর্ব ১৯৮৪ ও ১৯৮৬-র ‘শারদীয় কালান্তর’ পত্রিকায় এবং অন্ত্যপর্ব ১৯৮৭-র ‘শারদীয় প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পুরো উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জুলাই, ১৯৮৮ সালে। বুদ্ধদেবের *মাধুকরী* উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। দুটি উপন্যাসের রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। ‘ *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’* উপন্যাসের নাম শুনেই বোঝা যায় এই উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা। ‘ *মাধুকরী’* উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে দেখতে পাই মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা ন্যাশনাল পার্ক ও তার সংলগ্ন এলাকা। বাঘারু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। ঠুঠা হল বাইগা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে বাঘারুকে সশরীরে আমরা দেখতে পাই ঊনচল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে। উপন্যাসের বর্ণনা অনুসারে বাঘারুর শরীরটা একটা পুরোনো শালগাছের মতো। মুখে-চোখে কোনো ভাষা নেই, মাথার চুলের কোনো আলাদা রঙ নেই। তার শরীরের চামড়া গাছের বাকলের মতো। গাছের কাণ্ডে যেমন ফাটা-ফাটা অনেক দাগ থাকে, তেমনই বাঘারুর উদোম পিঠে ও পাছায় নানা দাগ দৃশ্যমান। পরনে একটি নেংটি। সেই নেংটি তার শরীরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে তাতে বাঘারুকে একটা গাছের মতোই মনে হয়। অতি সাধারণ মানুষের দলে ভিড়ে মিশে থাকলেও সে বেমানান হয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

সরলতাতেও সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জটিলতা কুটিলতা তাকে স্পর্শও করেনি। সমাজের আদপকায়দা তার অজানা। সমাজে সে নানা নামে পরিচিত। সেগুলো সমাজের মানুষেরই দেওয়া। তার প্রথম নাম 'কুড়ানিয়ার ছোয়া'। কারণ তার মা গয়ানাথের হয়ে কাজ করত। ফরেস্টের ভেতর থেকে শুকনো কাঠ, গাছের ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে আসার কাজ। তাই সেই কুড়ানিয়ার ছেলে বলে নাম হয় 'কুড়ানিয়ার ছোয়া'। দ্বিতীয় নাম হয় 'কুড়ালিয়া-কাটা'। কারণ ফরেস্টের মাঝে তার জন্ম হলে তার মা সদ্যোজাত শিশুর নাড়ি কাটে কুড়ালিয়া অর্থাৎ কুড়োল দিয়ে। তৃতীয় নাম হয় 'বাঘারু'। ফরেস্টের ভেতরে একটি বাঘকে ছোটো একটি লাঠি দিয়ে সায়েস্তা করে বলে লোকে তার নাম দেয় বাঘারু। এছাড়াও অবশ্য তার আর একটি নাম আছে 'ফরেস্টচন্দ্র বর্মন'। যেটি গয়ানাথ জোতদার দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্য। কিন্তু বাঘারু তার নিজের নাম হিসেবে সকলকে জানায় 'ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন'। তার যুক্তি হল:

> বর্মন এইঠে অনেক মিলিবে, ফরেস্টচন্দ্রও অনেক পাবেন, রায়-বর্মনও আছে, কিন্তু বাঘারু-বর্মন এই একোখান।[১]

কিন্তু এই নাম নিয়েও তার সমস্যা রয়েছে। তার দরকার সংক্ষিপ্ত নাম। কারণ তার মনে হয়েছে, "নামখান, এ্যানং বড় হয়্যা গেইল যে ঢলঢলাছে, খলখলাছে, খুলি-খুলি যাছে।"[২] সে বুঝতে পারে না মানুষের কোনটা নাম আর কোনটা সম্বোধন। যেমন, গয়ানাথ রায়বর্মনকে লোকে ডাকে 'গয়া জোতদার' বলে, এম এল এ বীরেন্দ্রমোহন রায়বর্মনকে ডাকে 'এ্যামেলিয়া' বলে। তাকে যখন বোঝানো হয় যে এইসব নাম মানুষকে তার কর্মের ভিত্তিতে সমাজের মানুষ দিয়েছে। এতেও তার সমস্যা কারণ হরেকরকম কাজ তাকে করতে হয়। আর তাতে মানুষও তাকে হরেকরকম নাম দেয়। কিছুদিন পর কাজও বদলে যায় আর নামও বেড়ে যায়। এই করে তার নাম এতো বড়ো হয়ে গেছে যে তার ধারণা নাম তার শরীরে ঢলঢল করছে। তাই সে এম এল এ-কে জানায়:

> পুরা একখান পালাটিয়া গান বান্ধ্যা হয়্যা গেইল—কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া-কোটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টুয়া, চন্দ্র বর্মন। মুই না চাও পালাটিয়া-গান। নামের পালাটিয়াখান ঢলঢলাছে, খলখলাছে।[৩]

সে চায় একটি মানুষের নাম।

অন্যদিকে '*মাধুকরী*' উপন্যাসে ঠুঠা বাইগাকে আমরা উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাই। পাঠকের সামনে প্রৌঢ় ঠুঠার প্রকাশ ঘটছে এইভাবে:

> এক বৃদ্ধ বাইগা এবং তার শিশু নাতি, নদীর মধ্যের একটি প্রস্তরময় জায়গাতে বসে আছে ছিপ ফেলে। নদী ও বনের আঙ্গিকের মতো। অবকাশ, দুজনেরই এই নীলাকাশের মতো। আকাশ-ছোঁয়া সব বোতল-সবুজ, জলপাই-সবুজ, ঘাস-ফড়িং-সবুজ গাছ ঝুঁকে পড়ে দেখছে সেই প্রায়-উলঙ্গ বুড়ো আর শিশুকে।[৪]

ঠুঠা অবিবাহিত। একটা সময় জঙ্গলে শিকার করে ফিরত। বুড়ো বয়সেও সে শিকার পাগল। জঙ্গলে এলেই রক্ত না-দেখলে, দু-হাতে পাখির পালক ফরফর করে বা জানোয়ারের চামড়া শব্দ করে নিজের হাতে না-ছিঁড়লে তার মন ভরে না। ঠুঠার মধ্যে এক ধরনের আদিমতা, গভীর প্রাগৈতিহাসিকতা আছে। জঙ্গলকে সে ভালোবাসে। ভালোবাসে বন্দুককে। আইনত শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার পরও সে বন্দুক সমর্পণ করে দেয়নি। কারণ সে বন্দুক ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতেও পারে না। তাকে ফোটা কার্তুজের গন্ধ যতটা আকর্ষণ করেছে

ততটা আকর্ষণ তার যুবক বয়সে কোনও নারী-শরীরও করেনি। খুব ছোটোবেলায় কাংড়ীতে আগুন পোহাতে গিয়ে তার দুটো হাতেরই কয়েকটি আঙুলের ডগা জ্বলে খসে পড়েছিল তাই থেকে তার নাম ঠুঠা।

মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্য আর সাতপুরা পর্বতমালাকে জুড়ে দিয়েছে মাইকাল পাহাড়শ্রেণি। এই বৃত্তের মধ্যে বয়ে চলেছে একদিকে বানজার নদী, অন্যদিকে হাঁলো নদী। এই দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলই হল কান্‌হা। কান্‌হা টাইগার প্রোজেক্ট ও তার সংলগ্ন এলাকা এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে। মুক্কির কান্‌হা টাইগার প্রোজেক্টের কোর এরিয়ার ভেতরে ছিল ঠুঠা বাইগার আদি বাস। বানজার নদীর ধারে ছিল। তাই তার গ্রামের নাম বানজারী। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে তাকে জঙ্গল থেকে দূরে হাটচান্দ্রায় বাস করতে হয়। কারণ অনেক পূর্বেই মহামারিতে তার জঙ্গলের সেই গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরে অবশ্য টাইগার প্রোজেক্ট হওয়ার পর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ভেতরের অনেক গ্রাম সরিয়ে নিয়ে গেছে অন্যত্র। মানুষজন, গোরু-বাছুর, ছাগল-মুরগি সমেত পুরোপুরি ছিন্ন করে সরিয়ে নিয়েছে। ফরেস্টের ভেতরে যখন গ্রাম ছিল তখন সেখানে শিশুর হাসিকান্না, যুবতীর কলহাস্য, স্নানরতা মেয়েদের পায়ের মলের আওয়াজ—এইরকম নানা আওয়াজে দারুণ জীবন্ত শব্দমুখর হয়ে থাকত। আজ সেখানে শুধু লাল ঘাসের ধু-ধু মাঠে বারশিঙা হরিণ লোমের কম্বল গায়ে জড়িয়ে মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়ায়। নয়তো বাঘেরা আলস্যে শুয়ে থাকে অথবা শৃঙ্গার করে। ঠুঠার গ্রামের বাসিন্দারা সবাই কলেরাতে শেষ হয়ে গেছে। সেটা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। গ্রামের মানুষ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই গোরু-মোষ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। রাইণ্ডারপেস্ট মহামারিতে। গোরু-মোষের মহামারি। ঠুঠার গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু ঠুঠার হৃদয়ে স্মৃতি রয়ে গেছে। গ্রামের গন্ধ, শব্দ, বোধ সব ঝুমঝুমির মতো বাজে ঠুঠা বাইগার অনুভবে। তাই একটু ফাঁক-ফোকর বা ছুতো পেলেই ঠুঠা ছুটে আসে মুক্কিতে। লুকিয়ে বানজার নদীর পাড়ের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। নিজের পিতা-প্রপিতামহর গ্রাম খুঁজে ফেরে। নিজের শিকড়কে খুঁজে ফেরে।

ঠুঠা দীর্ঘ দশ বছর ধরে নিজের গ্রামকে খুঁজে ফেরে। কিন্তু প্রতিবার সে ব্যর্থ হয়। কারণ জঙ্গলের গভীরে যে-কোনও গ্রাম পরিত্যক্ত হলেই জঙ্গল তার পাইক-বরকন্দাজদের পাঠিয়ে দেয় পুরোনো দিনের অত্যাচারী জমিদারদের মতো সেই গ্রামকে জবরদখল করতে। প্রকৃতি তার সবুজ হলুদ কালো নানা রঙের নিশানা উড়িয়ে দেয় আকাশে। বহুবর্ণের গালচে বিছিয়ে দেয় জমিতে। যার কারণে পরে আর চেনবার জো থাকে না। জঙ্গলে এসে ঠুঠার মনে হয়, "সবুজ শাড়ি পরা মেয়ের মতো সবুজ চুল উড়িয়ে, সবুজ পাড় ছড়িয়ে দৌড়ে যাচ্ছে জঙ্গল।"[৫] আর তাতে ঠুঠার পক্ষে তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্যের হয়ে পড়ে। তার গ্রামের দুই প্রান্তে দুটি মস্ত শিমুল গাছ ছিল, অত বড়ো জোড়া শিমুল সেই তল্লাটে আর ছিল না —এই স্মৃতিটুকু সম্বল করে ঠুঠা তার গ্রামকে খুঁজে বেড়ায়। সে হার মানতে রাজি নয়। একটা সময় প্রকৃতির মাঝেই প্রকৃতিরই অংশ হয়ে বাস করেছিল। সেই প্রকৃতি তার গ্রামকে গ্রাস করে নিলে সে প্রকৃতির ওপরে ক্ষোভ প্রকাশ করে। হয়তো কিছুটা নিজের ওপরেও। কারণ সে প্রকৃতি-বিযুক্ত হয়ে এখন বেজাত সাহেব কোম্পানির কর্মচারী হয়ে গেছে। সংগত কারণেই তার শরীর থেকে বনের গন্ধ দূরীভূত হয়েছে — এটা তার কাছে যন্ত্রণার। তাই তার মুখ থেকে শুনতে পাই:

> যতদিন প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতির এক জানোয়ার হয়ে বাস করেছিলাম ততদিন অন্য কথা ছিল। এখন বেরিয়েই যখন এসেছি...গা থেকে বনের গন্ধ মুছেই যখন গেছে...এখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। প্রকৃতিকে ভাল করে আমিও শেখাব। শালী! আমার গ্রাম না দেবে তো আমিও ওঁকে দেখে নেব। সাইয়াম, উইক্কে, কুসরে, ধারয়া, মারাই, বড়াহ্‌দেব সব দেব-দেবীরই আমি মাথা ফাটিয়ে দেব পাথর মেরে, যদি-না এই কান্‌হার বন আমাকে আমার গ্রাম ফিরিয়ে দেয়।[৬]

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে বাঘারুকে আমরা যতটা সহজ-সরল দেখি।*'মাধুকরী'*র ঠুঠা কিন্তু ততটা নয়। যদিও উপন্যাসে ঠুঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ঠুঠার অত গভীর ভাবনা ভাবার মতো মানসিকতা নেই। শিক্ষা নেই, বুদ্ধি নেই।"[৭] কিন্তু তার নিজস্ব মতামত রয়েছে। উচিত-অনুচিত বিচার করার ক্ষমতা তার আছে। সে অন্যের কথা মতো চালিত হয় না বরং সে অন্যকে জীবনে চলার পাঠ দিতে উৎসুক। অন্যদিকে বাঘারুর কোন বাড়ি নেই, ঘর নেই, নেই কোনও আপনজন। তার দেউনিয়া গয়ানাথ জোতদার। তার মায়েরও দেউনিয়া ছিল গয়ানাথ। তাই সে গয়ানাথের দ্বারাই পরিচালিত হয়। গয়ানাথের কথামতোই তাকে পরিচিত জায়গা ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হয়। তিস্তাপার ছেড়ে চলে যেতে হয়নাগরাকাটা ডায়না নদীর চরে। গয়ানাথের মহিষের বাথানে। বাঘারুর শরীর ছাড়া কিছু নেই। শুধু শরীর নয়, অতো বড়ো শরীর। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে দিয়ে আলাদা আলাদা কাজ করাতে পারে না। সে যা করে সারা শরীর দিয়েই করে। বাঘারুর শিশুবয়স থেকে ওঠা-বসা-চলা তিস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তিস্তাপারের প্রকৃতির সঙ্গে তার অস্তিত্ব মিশে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সে একাত্মতা অনুভব করে। ফরেস্টে, মাঠে, নদীতে, নদীর পাড়ের সঙ্গে সে যেন মিশে যেতে পারে। ফরেস্টে থাকলে তার শরীরটা একটা গাছের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে বাতাস ধরার জন্য। ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে বাতাসের ইশারা দেওয়ার জন্য। নদীর বুকে শোয়া থাকে যেন স্রোতের ইশারা দেওয়ার জন্য। অকৃত্রিম প্রকৃতির বুকে তার শরীরকে কখনও বেমানান মনে হয় না। কিন্তু মানুষের মাঝে কিংবা কৃত্রিম প্রকৃতির মাঝে সে নিজেকে বড়োই বেমানান মনে করে। গয়ানাথ তাকে যখন নাগরাকাটায় ডায়না নদীর চরে পাঠায় সেই যাত্রাপথে চা-বাগানের নির্জনতায় তার নিজেকে 'ন্যাংটিয়া' অর্থাৎ নগ্ন মনে হয়। সেখানে মানুষের হাতে পোঁতা হাজার হাজার চা-গাছ আর সারি সারি শিরীষ গাছের মাঝে বাঘারুর শরীর যেন প্রকৃতি-প্রদত্ত ইশারা হারিয়ে ফেলে। মাঠের মতো সমান চা-গাছের মাথা আর ছাতার মতো সমান শিরীষ গাছের মাথার মাঝখানে মানুষের বানানো আকাশ দিয়ে হাওয়া এসে বাঘারুর গায়ে লাগলে সে কুঁকড়ে যায়। এই অকৃত্রিম প্রকৃতির মাঝে এসে সে প্রথম অনুভব করে, তার শরীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড়ো। তার শরীরটা আর একটু ছোটো হলে ভালো হত কিংবা তার নেংটিটা আর একটু বড়ো হতে পারত। অর্থাৎ সেই মানুষ-সৃষ্ট চা-বাগানের ভেতর দিয়ে চলার মতো ছোটো কিংবা বড়ো। আবার নাগরাকাটা ডায়নার চরে যাওয়ার পথে ঘটনাচক্রে যখন জনসমুদ্রে বাঘারু মিশে যায় তখন সেই জনসমুদ্র থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণবাঘারু নিজে কখনও ঘটনা ঘটিয়ে তুলতে পারে না। তাকে নিয়ে শুধু ঘটনা ঘটে যায়। জনমিছিলে জড়িয়ে পড়েও সে মিছিলে মিশে যেতে পারে না, মিছিলের অংশ হয়ে যেতে পারে না। এর কারণ তার দীর্ঘ শরীর। ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে সে যখন ভিড়ের বেগেই ছুটতে থাকে তখন মনে হয় সে ওই ভিড়ের মাস্তুল। বহু পেছনের মানুষও তার মাথা দেখেই দিক ঠিক করবে। বাঘারু ভিড়ের সঙ্গে স্রোতের বেগে ছুটলেও বাঘারু স্রোত হয়ে যেতে পারে না। সে স্রোত

নয়, স্রোতবাহিত। তিস্তার স্রোতের টানে যেমন ওপড়ানো শালগাছ ছোটে তেমনই জনসমুদ্রে বাঘারু ছোটে। তবে এক সময় মিছিল বাঘারুর থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়। কারণ বাঘারু নিজেকে আলাদা করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সে শুধু সবকিছুর স্রোতে ভেসে যেতে পারে।

আর এই স্রোতে যে ভেসে যেতে পারে না এবং ভেসে যাওয়া পছন্দ করে না সে হল ঠুঠা বাইগা। ঠুঠা পরিবেশ পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে জঙ্গল ছেড়ে কিছুটা দূরে হাটচান্দ্রায় এসে বাস করে। হাটচান্দ্রা শেলাক কোম্পানির নাইট-ওয়াচম্যানের কাজ করে ঠুঠা। কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে আসা তার কাছে বড়ো বেদনার। তার মতো জংলির আসল জায়গা ছিল জঙ্গলেই। জঙ্গলে যতদিন ছিল ততদিন ঠুঠা ছিল সাচ্চা মানুষ। প্রকৃতির আশীর্বাদে সম্পৃক্ত একজন সম্পূর্ণ মানুষ। শহরের চাকচিক্য এবং নানারকম লোভ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। ঠুঠাকেও দিয়েছে। জঙ্গল ছেড়ে এসে পাঁচরকম মানুষের সঙ্গে মিশে ঠুঠার ঠুঠাত্ব একেবারেই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। শহরে থেকে ঠুঠা হয়ে গেছে ঝুঠা বাইগা। তাই ঠুঠা আরও বেশি নিজের গ্রাম, নিজের শিকড়কে খুঁজে পেতে উদ্‌গ্রীব হয়। তার মতে, "যার শেকড় যার নেই; তার কিছুই নেই। সংরক্ষণ করে রাখার মতো যার কিছু নেই, তার বাঁচা-মরায় তফাতও নেই।"[৮] ঠুঠা মনে করে, কোনও গাছের শিকড় শুকিয়ে বা মরে গেলে গাছটি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে বটে, দূর থেকে দেখে বোঝা না গেলেও গাছটি মৃত। ঠুঠা তেমন বাঁচা বাঁচতে চায় না। যেখানে তার নিজস্ব সত্তা বলে কিছু থাকবে না। সেটা মৃত্যুসম। শহরের মানুষরা ঠুঠার চোখে জানোয়ারের মতো। শহরের পরিবেশও মানুষ দেখে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শহরের মানুষের মতো বিলাসবহুল জীবনের লোভে সেই প্রতিযোগিতার স্রোতে গা না-ভাসিয়ে সে নিজের আদিমসত্তাকে ফিরে পেতে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে চায়। সে অনুভব করে জঙ্গলই তার সর্বস্ব।তাই সে একসময় টানা কুড়ি দিন ধরে জঙ্গলে থেকে দিনরাত এক করে নিজের গ্রামকে খোঁজে। অবশেষে সে খুঁজে পায় সেই জোড়া শিমুল গাছ। খুঁজে পায় ছেলেবেলার বানজার নদী, তার প্রিয় সখাকে।

দুটি উপন্যাসেরই দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র বাঘারু ও ঠুঠা। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র তারা নয় । সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়েই তারা বিচরণ না করলেও লেখক দুটি চরিত্র উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে তাঁর বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেব গুহ যেমন ঠুঠার নিজের শিকড় অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে শহুরে বিলাসবহুল জীবনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। শহরের প্রত্যেকের 'আরও চাই আরও চাই' এই ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, নিজেদের পুরোনো ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বিসর্জন —এইসব বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঠুঠার মধ্যে দিয়ে। তেমনই দেবেশ রায় বাঘারুকে দিয়ে নিঃশব্দে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসে দেখি যে-তিস্তা ব্যারেজ তিস্তার পার্শ্ববর্তী মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বাঘারু নিঃশব্দ প্রতিবাদে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে তিস্তার পার ছাড়িয়ে হাঁটতে থাকে। উপন্যাসে বাঘারু এবং ঠুঠা দুজনেরই অস্তিত্বের সংকট লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাঘারু নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয়। বরং আমরা পাঠকরা তার অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধি করি। অস্তিত্বহীন বাঘারু প্রাতিষ্ঠানিক কোনও পরিচয়ের পিছনে না-ছুটে জীবনের টানেই ছুটে চলেছে। চলমান তিস্তার মতোই সে কেবল জীবনের টানে বয়ে

চলেছে। তাই উপন্যাসে দীর্ঘ আখ্যানের মধ্যেও বাঘারুর অবস্থান আমরা অপরিবর্তিতই দেখি। সমালোচক রুশতী সেন বলেছেন:

> লেখক হিসাবে তাঁর অবস্থান তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার আগেও যেমন ছিল, এ বৃত্তান্ত শেষ করেও যে তিনি একই জায়গায় থেকে গেলেন, এমন চৈতন্যের যন্ত্রণা দেবেশ রায়কে ছেড়ে যায় না কখনও।[৯]

এখানে বাঘারু চরিত্র সৃজনে এবং লেখকের অক্ষমতার মূল্যায়নের চেষ্টাই হয়তো করেছেন সমালোচক। অন্যদিকে ঠুঠা নিজের জন্মভিটে, নিজের ভালোলাগার গ্রাম-নদী হারিয়ে, ভালোবাসার জঙ্গলের ঠাঁই হারিয়ে শহরে এসে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। কিন্তু সে পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছে মাথা নোয়ায়নি। সে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে এবং সে সফল হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. রায় দেবেশ, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১০৯।
২.তদেব, পৃ. ১০৯।
৩.তদেব,পৃ. ১১২-১১৩
৪. গুহ বুদ্ধদেব, *মাধুকরি*, প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, পৃ. ১১।
৫. তদেব, পৃ.৫৫।
৬. তদেব, পৃ.৬১।
৭. তদেব, পৃ. ৫৯।
৮. তদেব, পৃ.১৫৮।
৯. সেন রুশতী, *সমকালের গল্প-উপন্যাসে প্রত্যাখানের ভাষা*, প্রকাশসাল ১৯৯৭, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, পৃ. ২৬।